জলবায়ুতে পরিবর্তন

এবনে গোলাম সামাদ

জলবায়ুতে পরিবর্তন অনেকবার ঘটেছে। অতীতে জলবায়ুতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার কথা জানা যায় জীবাশ্মের (Fossil) অনুশীলন করে। অনেক সময় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঢাকা পড়েছে বরফে। এ রকম সময়টাকে বলা হয় হিমযুগ (Ice Age)। হিমযুগ শেষ হয়েছে। বেড়েছে পৃথিবীপৃষ্ঠের উষ্ণতা। অনেকেই এই সময়টাকে উল্লেখ করেন সূর্যযুগ (Sun Age) হিসেবে। অনেক সময় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে চলেছে খরা। আবার অনেক জায়গায় হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। জলবায়ুর এ রকম পরিবর্তন ঘটে কেন, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে অনেক মতবাদ। পৃথিবী দৈনিক তার অক্ষের (Axis) ওপর হেলে ঘোরে। এই হেলে থাকার মাত্রা কম-বেশি হয়। এর ফলে জলবায়ুতে আসে পরিবর্তন। কারণ আগে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সূর্যরশ্মি যেভাবে পড়ত সেভাবে আর পড়তে পারে না। ফলে ঘটে আগের তুলনায় বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রার পার্থক্য। পৃথিবী সূর্যকে বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর এই প্রদক্ষিণ বা কক্ষপথের কিছুটা হেরফের হতে পারে। আর এর ফলে আসে জলবায়ুতে পরিবর্তন। সূর্য সব সময় একইভাবে তাপ বিকিরণ করে না। সূর্যের তাপ বিকিরণের মাত্রা কম বেশি হয়। যার প্রভাব পড়ে পৃথিবীর জলবায়ুতে। পৃথিবীর জলবায়ু নির্ভর করে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রার ওপর। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা কমলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমে। আবার বাড়লে বাড়ে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা।

অতীতে অনেক সময় বাতাসে কমেছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ, এসেছে জলবায়ুতে পরিবর্তন। একটি হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড আছে, যদি কোনো কারণে তার পরিমাণ অর্ধেকে নেমে আসে তবে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পাবে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখন বলা হচ্ছে, কলকারখানা ও যানবাহন থেকে প্রতিদিন যে পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বাতাসে যুক্ত হচ্ছে, তাতে বাড়ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা। আর এর ফলে বিশ্বের জলবায়ূতে আসতে চাচ্ছে পরিবর্তন। বাড়ছে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। একটি হিসাব অনুসারে বর্তমান শতাব্দী শেষ না হতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর এর ফলে পৃথিবীর মেরুমণ্ডলের সব বরফ গলে যাবে। বরফ গলে যে পরিমাণ পানির সৃষ্টি হবে, তাতে বাড়বে সমুদ্রের পানির পরিমাণ। আর এর ফলে ডুবে যাবে অনেক দ্বীপ, অনেক সমুদ্র তীরবর্তী নিচু অঞ্চল। যার কারণে হাজার হাজার মানুষ হবে গৃহহীন। ঠিক এ রকম কিছু ঘটবে কি না তা নিয়ে অবশ্য বিশেষ মহলে মতের অমিল দেখা দিয়েছে। কারণ ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্র থেকে বেশি জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হতে থাকবে। এর ফলে আগের তুলনায় অনেক বেশি সৃষ্টি হবে মেঘ। মেঘ সূর্যরশ্মি আটকাবে। ফলে সূর্যরশ্মি আর আগের মতো এসে পড়তে পারবে না ভূপৃষ্ঠে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমবে। এ ছাড়া বৃষ্টির পানি কমাবে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ূমণ্ডলের তাপমাত্রা। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা কেবল যে বাড়তেই থাকবে সেটা ভাবা ঠিক নয়।

মেক্সিকোর পূর্ব উপকূলে আছে কানকুন (Cancun) নামে একটি শহর। শহরটি বেশ সুন্দর আর

সমৃদ্ধ। এখানে বসেছিল জাতিসঙ্ঘের ডাকা এ বছরের জলবায়ুসংক্রান্ত সম্মেলন, যা শেষ হয়েছে ১১ ডিসেম্বর। এটা ছিল ১৬তম সম্মেলন। এর আগের সম্মেলন হয়েছিল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে ঠিক করা যায়নি বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হওয়ার পরিমাণ কমানোর উপায়। বর্তমান সম্মেলনেও বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধিরোধে কোনো পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব হলো না। মনে হচ্ছে না ভবিষ্যতে কোনো সম্মেলনে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আসা সম্ভব হবে। কারণ শিল্পোন্নত দেশগুলো বলছে, তাদের কলকারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা কমাতে গেলে তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য দিকে চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো দেশ বলছে, তারা বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা কমানোর জন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণে সক্ষম নয়। কারণ তাহলে তারা পারবে না দেশে কলকারখানার অর্থনীতি গড়ে তুলতে। সবচেয়ে আলোচ্য হয়ে উঠেছে চীন। আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদক দেশ। কিন্তু এখন সেই স্থান অধিকার করতে চলেছে চীন। চীন বলছে, সে আরো কলকারখানা গড়বে। চীনের সব কলকারখানাই চলেছে প্রধানত কয়লা পুড়িয়ে, যা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড।

কানকুন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে একটি বিশেষ তহবিল গঠনের। এই তহবিল থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। এই অর্থের জোগান দেবে ধনী দেশগুলো। এই তহবিল থেকে সাহায্য নেবে না ভারত ও ব্রাজিলের মতো উন্নয়নগামী দেশ। স্থির হয়েছে এই তহবিল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১০০ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন =১০০ কোটি) প্রতি বছর বিতরণ করা হবে খুব দরিদ্র বলে বিবেচিত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে ক্ষতি হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাতে এই পরিমাণ সাহায্য বাস্তবে কোনো কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মানুষ ঠিক কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নিয়ে চলেছে বিতর্ক। অনেকের মতে, বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ- পূর্ব ভাগের নদীগুলো প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে পলিমাটি নিয়ে সমুদ্রে ফেলছে। এতে ভরাট হচ্ছে সমুদ্র। বাড়ছে বাংলাদেশের ভূমির পরিমাণ। জলবায়ুর পরিবর্তনে যে পরিমাণ পানি বাড়ছে, তার চেয়ে পলি পড়ে ডাঙ্গার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। তাই আগামীতে বাংলাদেশের ভূমির পরিমাণ শেষ পর্যন্ত বাড়বে বলেই মনে করা যায়; কমবে না সমুদ্রের পানিতে ডুবে। কিছু দিন আগে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের একজন বিশেষজ্ঞ (মীর মনিরুজ্জামান) বলেছেন, সাগরের পানি ব্যবহার করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষäতা বৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব।

তার মতে, বাংলাদেশে সেচের কাজে যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করা হচ্ছে তার শতকরা ৮০ ভাগ হলো ভূগর্ভস্থ পানি। কিন্তু এই পানির সঞ্চয় দ্রুত কমে আসছে। সমুদ্রের পানিকে তাই লবণমুক্ত করে সেচের কাজে ব্যবহার করতে হবে। সব দেশে যদি সেচ এবং অন্যান্য কাজে লবণমুক্তভাবে পানি ব্যবহার আরম্ভ করে তবে মেরুমণ্ডলের বরফ গলে যে বাড়তি পানির উদ্ভব হবে তা কোনো সমস্যার কারণ হয়ে উঠবে না। মনে হচ্ছে অনেক ভুল কথা প্রচার করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়া মানেই মানুষের ক্ষতি হওয়া নয়। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়লে সাধারণভাবে বৃদ্ধি পাবে খাদ্য উৎপাদন। কারণ সবুজ গাছপালা

বাতাস থেকে বেশি করে গ্রহণ করবে কার্বন ডাই অক্সাইড। আর অধিক পরিমাণে উৎপাদন করবে কার্বোহাইড্রেট। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়লে বাড়বে খাদ্যশস্যের উৎপাদন। অন্য দিকে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়লে তার একটা অংশ সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত হয়ে উৎপন্ন হবে কার্বোনিক অ্যাসিড। যার সাহায্যে সামুদ্রিক শৈবালরা উৎপাদন করতে পারবে অধিক হারে কার্বোহাইড্রেট, যা সামুদ্রিক মাছকে জোগাবে খাদ্য, বাড়বে সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ, যা হতে পারবে মানুষের খাদ্য। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই যেমন সাইবেরিয়া ও কানাডার কিছু অংশে মাটির মধ্যে পানি জমে থাকে বরফ হয়ে। গাছের শেকড় যা গ্রহণ করতে পারে না। এসব জায়গায় গম, যব, গোল আলুর মতো ফসলের আবাদ করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে এই সমস্যা থাকবে না। বাড়বে পৃথিবীর মোট আবাদি ভূমির পরিমাণ। তবে পৃথিবী এখন বিভক্ত হয়ে আছে নানা জাতিরাষ্ট্রে। এসব দেশে খাদ্য উৎপাদনের অর্থ তাই দাঁড়াবে না অন্য দেশের মানুষ খেতে পাওয়া। তাই প্রত্যেক দেশকে ভাবতে হবে তার নিজের সমস্যা নিয়ে, নিজের মতো করে। বাংলাদেশকে তার সমস্যা সমাধানের জন্য খুঁজে বের করতে হবে উপযুক্ত কর্মকৌশল। কেবল আন্তর্জাতিক সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে ভুল কাজ করা হবে।

লেখক : প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট

[সূত্রঃ নয়া দিগন্ত, ২০/১২/১০]

http://www.sonarbangladesh.com/articles/IbnGolamSamad